Vol. 40 | No. 1 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সোস্যুর এবং ভাষা বর্ণনা

Volume	40
Issue	1
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	উদয় নারায়ণ সিংহ
Published online	October 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v40i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i1.3
Pages	41-52
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সোস্যুর এবং ভাষা বর্ণনা

উদয় নারায়ণ সিংহ

১. ভূমিকা : ভাষাভূমি

ভাষার পৃথিবীতে একটা আপাত নৈরাজ্য আছে যার প্রথম দর্শনে যেকোনো তাত্ত্বিক বলবেন

ক. ভাষা অত্যন্ত বিভেদ-বিভ্রমী;

খ. অত্যন্ত ব্যক্তিগত, অথচ একই সঙ্গে সমষ্টির সংজ্ঞায় বাঁধা;

গ. অতীব ভঙ্গুর ও মরণশীল;

ঘ. জাতি, ধর্ম, শ্রেণী, লিঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক এককের সঙ্গে সম্পর্কিত অথচ একেবারে স্বতন্ত্র; এবং

ঙ. ভাষার আকরণই এমন যে তার এক পা পৃথিবীতে, অন্যটি আকাশে—একপক্ষে ধ্বনি নামক ভাষাঙ্গটি যেমন বাস্তব উচ্চার্য এবং ব্যবহার্য সত্য, অর্থের দিকটি যেন তেমনি না জানা না বোঝা না ধরা এক উচ্চাঙ্গ বিমূর্ত কল্পনা।

ভাষার এই বিভিন্নতা, বর্ণন-কঠিনতা, অনিত্যতা, স্বাতন্ত্র্য বেং বৈপরীত্য—পাঁচটি বিশিষ্টতা নিয়ে যুগ-যুগ ধরে দার্শনিক, ব্যাকরণবেত্তা, সাহিত্যিক অথবা নিছক চিন্তাশীল ভাষী মানুষমাত্রই অনেক কথাই ভেবে এসেছেন। যাঁরা ভাষার বিভিন্নতার রহস্যভেদ করতে জীবনপাত করেছেন তাঁদের মধ্যে একদল বলছেন প্রতিটি ভাষা অন্যটির থেকে বিভিন্ন—চলনে বলনে গঠনে উচ্চারণে, অতএব ভাষার ছাত্রদের উচিত এই ভাষাভেদের স্বরূপ-নির্ণয় করা, এক ভাষা থেকে অন্যটির পার্থক্যের পরিমাপ করা এবং একটির থেকে অন্য সবগুলির দূরত্বের নিরিখে ভাষাবিশেষের চরিত্র-নির্ধারণ করা। আবার অন্যদল বলছেন—এমন বিষম বিজ্ঞান ভাষাবিদকে করবে বিভ্রান্ত; বরং আমাদের ভাষাসমূহের মধ্যে পরস্পরভেদ সত্ত্বেও যে অন্তর্নিহিত সাম্য রয়েছে, ভাষিক সর্বজনীনতার যে ফল্গুধারা বয়ে চলেছে প্রতিটি ভাষার ও ভাষীর ধমনীতে—আমাদের সেই সার্বিকতাটিকেই জানতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে।

অনেক ভাষাবিদ্, ভাষার অধ্যেতা মনে করছেন ব্যক্তি যেহেতু একটি মূর্ত ও ধর্তব্য একক-বিশেষ এবং সমাজ ও সমষ্টি যেহেতু সরাসরিভাবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, অতএব ভাষার বিশ্লেষণের জন্য আমাদের নির্ভর করতেই হবে এই মূর্ত ব্যক্তি মানুষটির ওপরেই—সমাজ নামক কোনো অলীক কল্পনার ওপর নয়। তাই ভাষা বিশ্লেষণের নানান পদ্ধতি তৈরী হলো এই ব্যক্তিনির্ভরতার ভিত্তিতেই। আবার অনেকে দেখালেন এক মানুষের এক জীবনেই দেখা যাচ্ছে নানান ধবনের বাক্-বিবিধতা—একই কথা সে দুবার দুভাবে বলছে, দশবার দশরকম উচ্চারণ করছে; অতএব ব্যক্তিনির্ভর মূর্ত ভাষাচর্চা আমাদের খুব বেশিদূর নিয়ে যেতে পারে না। আমাদের সমষ্টির কথা বলতেই হবে। কিন্তু সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের নিন্দুকেরা জানতে চাইলেন সমষ্টির ভাষা বৈশিষ্ট্য থেকে কী এমন জানা যাবে যা ব্যক্তির ভাষার অধ্যয়নে আমরা পাই না? উত্তরে জানা গেলো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথা—প্রথমত, ব্যক্তি-ব্যক্তিতে এতো ভাষা বিভেদ সত্ত্বেও এটাই কী আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে এক ভাষাভাষী সমাজবদ্ধ মানুষ এসব আপাত বিভেদের সীমাকে পার করে একে অন্যকে বুঝতে পারে? তার মানে নিশ্চয়ই এই যে বিভেদের ব্যাকরণের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ব্যাকরণ আছে লুকিয়ে প্রতিটি ভাষাভাষী সমাজে যাকে সামাজিক ব্যাকরণ বলা যায়।

ভাষার জিয়নকাঠি-মরণকাঠি দুটোই সেই ভাষাভাষী মানুষের হাতেই। যদি কোনো ভাষিক সমাজের মানুষ স্বেচ্ছায় বা প্রলোভনে অথবা বাধ্য হয়ে অধিকতর 'শক্তিশালী' কোনো ভাষাকে নিজের করে নেন—নিজেদের ভাষাকে দেন বিসর্জন—যাকে আমরা বলে থাকি ভাষার "বিস্থাপন", তাহলে একটা সময় আসবে যখন এই বিশেষ ভাষাটি ক্রমবিলুপ্ত হবে। এ হলো ভাষার সামাজিক কারণে মৃত্যু। নৃতাত্ত্বিকেরা আবার এমন অনেক ভাষার বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন যেগুলি শুধু এইজন্য প্রায়-বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে যে তার জ্ঞাতা-বক্তারা গেছেন ফুরিয়ে। আবার বহু ভাষা আজ আর নেই কারণ ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সেগুলি গেছে বহুধা-বিভক্ত হয়ে—শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে—যার প্রতিটি শাখা ভাষাই হয়ে উঠেছে একেকটি স্বতন্ত্র ভাষা। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই ক্ষয় ও ক্ষরণের অলিখিত অথচ অকাট্য নিয়মে ভাষামাত্রেই ক্রমাগত যাচ্ছে বদলে—তাই যদি হয় তো ভাষাবিজ্ঞানী কোন ভাষার বর্ণনা করবেন? কারণ দেখা যাবে যে যতক্ষণে তাঁর বর্ণনার জন্য সামগ্রীর জোগাড় হবে সম্পূর্ণ ততক্ষণে সেই ভাষা বিশেষের রূপ গেছে বদলে। অতএব বর্ণিত ভাষারূপ যাচ্ছে অবর্ণনীয় রূপে বদলে—কোনো বিশ্লেষকই যাকে পারছেন না ধরতে-ছুঁতে। সোস্যুরের আগের পর্বের ভাষাবিদ্ এই সংকটের কোনো সমাধান পাননি খুঁজে।

সমাজবিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও সাহিত্য— এই সব ক'টি বিষয়েই ভাষাচর্চার একটা নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। কিন্তু মানববিদ্যার এই বিশাল জ্ঞানক্ষেত্রে ভাষার বর্ণনাতত্ত্ব গড়তে গিয়ে আমরা কি ভাষার দেয়াল পার ক'রে অন্যান্য মানবিক বিদ্যার ইতিহাস থেকেও শিক্ষা নেবো? এইসব তাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার কি এমন কিছু বিশ্লেষণী বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি ভাষাবিদদেরও কাজে লাগবে? অপর ভাষাতত্ত্বের কী এমন একটা স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে যে বাগ্-বর্ণনার জন্য একটা সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার করা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন ও সম্ভব—এসব নিয়েও সোস্যুর ছিলেন অত্যন্ত ভাবিত। এপ্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, সোস্যুরের জন্ম স্থান একটা সংক্রমণকালে (১৮৫৭ খ্রি.) হয়েছিল, যখন প্রায় একই সময়ে একবছর আগে-পরে জন্মেছিলেন আধুনিক মনস্তত্ত্বের জনক ফ্রয়েড (১৮৫৬ খ্রি.) এবং আজকের সমাজবিজ্ঞানের একজন প্রধান স্তম্ভবিশেষ—এমিল ডার্কহাইম (১৮৫৮ খ্রি.)। অতএব ভাষাবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র সত্তার সন্ধান কিংবা ভাষার সঙ্গে অন্যান্য মানবীকি এককের চরিত্রগত মিলের খোঁজ করা সোস্যুরের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক।

যে পঞ্চম সমস্যার কথা গোড়াতেই বলেছি, যেকোনো সাধারণ মাপের তাত্ত্বিক তার সমাধান করবেন এই বলে যে মানে হলো বনের পাখি, মায়ামৃগ—তার চেয়ে ধরো চেপে ধ্বনি নামক হাতের পাখিকে। সোস্যুর কিন্তু এভাবে এগোলেন না। বরং ধ্বনি-ব্যবহারের মূল তন্ত্রের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন একই মানুষ ব্যবহার করে বা ধ্বনি ছাড়াও আরো নানান ধরনের চিহ্ন—লিপি, সুর, অঙ্গভঙ্গি, চিত্ররেখ, নাচের মুদ্রা ও ভাষা-ইতর নানান স্বর, প্রভৃতি বিভিন্ন সংকেতক। প্রতিটিরই ব্যবহারের একটা গৃহীত স্বীকৃত নিয়ম আছে—যার কিয়দংশ সর্বজনীনতার সূত্রে সাধা, বাকিটা সমাজ-সংস্কৃতি বিশেষের নিয়মে বাঁধা। অতএব উনি বললেন একটা ভারী বিজ্ঞানের কথা যার জন্ম অবশ্যম্ভাবী ও আবশ্যিক এবং ভাষাবিজ্ঞান হবে এই বিশাল বিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গমাত্র—যার পূর্ণতার রূপের নামকরণ করলেন 'চিহ্নবিজ্ঞান' (Semiology) ব'লে। ওঁর *Course in General Linguistics* (যা ফরাসী বই Cours de linguistique ge´ne´rale-এর ১৯১৬র সংস্করণের ইংরেজি অনুবাদ—১৯৬০এ প্রকাশিত) বইয়ের এক জায়গায় তাই উনি বলছেন :

We can therefore imagine a science which would study the life of signs within society ... We call it semiology, from the Greek semeion ('sign'). It would teach us what signs consist of, what laws govern them. Since it does not yet exist we cannot say what it will be; but it has a right to existence; its place is assured in advance.

Linguistics is only a part of this general science; and the laws which semiology discovers will be applicable to linguistics, which will thus find itself attached to a well defined domain of human phenomena (*Course*, 1960:16)

এই পাঁচটি তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান সোস্যুর যেভাবে করলেন তাতে ভাষাবিজ্ঞানেরই শুধু নক্‌শা বদলে গেলো তাই নয়— সমস্ত মানবীকি বিদ্যাতে, সাহিত্যে ও সমাজ-বিষয়ক সবকটি ক্ষেত্রেই একটা বড়ো ধরনের পরিবর্তন এলো—জন্ম নিলো একটা নতুন আলোড়ন, নব আন্দোলন যাকে আমরা 'সংরচনাবাদ' বা 'আকরণবাদ' (Structuralism) নামে জানি।

২. ব্যক্তিত্ব

ফেয়ারদিনাঁ দ্য সোস্যুর জন্মেছিলেন ১৮৫৭ সালে জেনিভার এক বিজ্ঞানী পরিবারে এবং প্রথমে উনি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করবেন বলে জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, যদিও তার বছর খানেক আগে থেকেই ওঁর সংস্কৃতচর্চার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। ১৮৭২এই উনি ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক নিজের প্রথম নিবন্ধ লিখেছিলেন ('Essai sur les langues') যার মূলে ছিল সোস্যুর পরিবারের এক ভাষাবিজ্ঞানী বন্ধু আডল্‌ফ পিকটেটের এই পঞ্চদশবর্ষীয় তরুণকে উৎসাহ প্রদান। তখনি উনি ফরাসী ও জর্মন ছাড়াও দুটি প্রাচীন ভাষা-গ্রীক ও লাতিনে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। কাজেই প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও ভাষাশিক্ষা ও ভাষাচর্চায় ওঁর উৎসাহ কখনোই কম হয়নি। ১৮৭৬এ সোস্যুর প্যারিস্থিত 'সোসিয়েতে দ্য লিংগুইস্তিক দ্য পারী'-তে যোগদান করেন এবং সেই বছরই লাইপজিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পড়তে যান। এই স্থান-নির্বাচন সেকালের ভাষাচর্চার ইতিহাসের ধারার দিকে তাকালে খুবই উপযুক্ত বলা যায়, কারণ তুলনাত্মক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে একদল তরতাজা তরুণ জর্মন ভাষাবিদ্ সেকালে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন এনেছিলেন (যাঁদের 'জু গ্রামাতিকের' বলা হয়), লাইপজিশই ছিল তাঁদের কেন্দ্রবিশেষ। ফলে উনি রুগ্‌মানের মতন ভাষাতাত্ত্বিকের ছাত্র হতে পেরেছিলেন—ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্রের (Laws of sound change) আবিষ্কারও প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। অতএব, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে ২১ বছর বয়সেই ১৮৭৮এ, সোস্যুর ছাত্র অবস্থাতেই নিজেই একটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার স্বরধ্বনি বিষয়ক একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত করেন, যার নাম দিয়েছিলেন 'Mémoire sur le systéme primitif des voyelles dans les langues indo-europe'ennes'।

এই বইটি বেশ সমাদর পেলো ভাষাতত্ত্ব মহলে এবং এই প্রতিভাদীপ্ত লেখাটি সম্বন্ধে যতো বলা যায় কম হবে। 'জিজ্ঞাসা'-র ২.২ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে প্রবাল দাশগুপ্ত (১৯৮১) এ বিষয়ে বলেছেন :

"... বহুদিন বাদে, ১৯২০-৩০ নাগাদ, আস্তে আস্তে বোঝা গেলো ফেয়ারদিনাঁ অল্প বয়সে ১৮৭৯ সালে যা করেছিলেন সেটা কী সাংঘাতিক কাজ। গোয়েন্দাগিরি করে বেরোলো যে, আদি ভারোতীয় ভাষায় যে হ ধ্বনির অস্তিত্ব ফেয়ার দিনাঁ কল্পনা করেছিলেন, সেই হ সত্যিই যে ছিলো তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে হিত্তী ভাষার সদ্য আবিষ্কৃত পুরোনো দলিলে। তার কথা ফেয়ারদিনাঁ বেঁচে থাকতে কেউ জানতো না। ওই হ ধ্বনির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছিলো না ফেয়ারদিনাঁর জানা কোনো ভারোতীয় ভাষায়। হ-টার কথা উনি প্রায় মন্ত্রবলে জেনেছিলেন বলতে হবে।"

যা প্রায় পঞ্চাশ বছর পর তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে 'ল্যারিঞ্জিয়াল থিওরী' বলে পরিচিত হবে নতুন হাতে-পাওয়া সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে (কিউনিফর্ম হিত্তাইত ভাষার আবিষ্কারের পর) এবং যে ধরনে ধ্বনিতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ সোস্যুর দিতে পারেননি অথচ যার প্রস্তাব উনি সে যুগে রেখেছিলেন—তা সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র সোস্যুরের নতুন ধারার চিন্তার ফলেই। উনি গ্রন্থের ভূমিকাতেই লিখেছিলেন :

" I am not speculating on obtruse theoretical matters out enquiring into the vary basis of the subject without which everything is unanchored, arbitrary, and uncertain."

১৮৭৮-৯ সালে সোস্যুর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান ভাষাতত্ত্বে উচ্চতর শিক্ষার জন্য এবং শেষমেষ ১৮৮০তে লাইপজিশ থেকে নিজের গবেষণা কর্ম 'De l'emploi du ge´nitif absolu en sanscrit'—এই বিষয়ে রচনা করেন এবং 'Summa cum laude' ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে প্যারিসে চলে আসেন। সেখানে ১৮৮০ থেকেই Ecole pratiques des hautes e´tudesএ উনি সংস্কৃত, গথিক এবং প্রাচীন জর্মন ভাষার অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৮৮৭ নাগাদ এরই সঙ্গে উনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানও পড়াতে আরম্ভ করেন। তরুণ ফরাসী ভাষাবিদ্ মহলে সোস্যুরের চিন্তাধারার প্রভাবের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ ১৮৯১ সালে বিশেষ সম্মান রূপে ওঁর 'Chevalier de la Legion d'Honneur' উপাধির প্রাপ্তি প্যারিস থেকে। তবে সে বছরই উনি নিজের প্রাক্তন বিদ্যাক্ষেত্র জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এখানেও উনি কিছুটা পেছিয়ে থাকা ছাত্রদের যত্ন নিয়ে সংস্কৃত ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পড়াতে শুরু করলেন—তবে ততোদিনে নতুন ভাষা-বিজ্ঞান-নির্মাণের জন্য নানা ধরনের চিন্তা-ভাবনা উনি শুরু করেন তার একাধিক

প্রমাণ ওঁর লেখা অন্য ভাষাতাত্ত্বিক বন্ধুদের লেখা চিঠি থেকেই পাওয়া যায়। ওঁর যে নানান বিষয়ে পড়াশোনা ও উৎসাহ ছিল তা বোঝা যায় এ থেকে যে এই সময়ে উনি জর্মন পুরাকথা, লাতিন কবিতার শৈলীতত্ত্ব ও লিথুয়ানিয়ান ভাষা নিয়ে কাজ করতে থাকেন একই সময়ে।

তবে সুযোগ এলো ১৯০৬এর পর অন্য এক অধ্যাপকের অবসর গ্রহণের পর যখন ১৯০৭, ১৯০৮-৯ ও ১৯১০-১১ সালে সোস্যুর পড়াতে শুরু করলেন প্রাবেশিক বা সামান্য ভাষাবিজ্ঞান। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী চিন্তাধারা দেখা দিলো সোস্যুরের তত্ত্বচিন্তা ও বক্তৃতায় তার থেকে আমূল পরিবর্তন ঘটলো সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব, মনোবিদ্যা, নৃতত্ত্ব এবং সংপ্রেষণ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। এই সময়ে সোস্যুর যে একেবারে অভিনব ভাষাতত্ত্বের সংকল্পনাকে রেখেছিলেন সযতনে প্রিয় ছাত্রদের সামনে—তা ওঁর অনুগত ছাত্রেরা বিস্তারে লিখে নিয়েছিলেন— এবং ১৯১৩ সালে সোস্যুরের অসুস্থতা ও মৃত্যুর পর যা থেকে ওঁরই দুই ছাত্র বালি ও সেশেহায়ে সম্পাদনা করে সর্বপ্রথম ফরাসী ভাষায় Cours de linguistique generale নামে প্রকাশিত করেন। শুনতে অদ্ভুত লাগে, কিন্তু যে গ্রন্থের জন্য সোস্যুর বিখ্যাত হলেন এবং যার থেকে 'সংরচনাবাদ'-এর গোড়াপত্তন হলো সেটি উনি নিজে লিখে যেতে পারেননি।

সোস্যুরের জীবন ও তাত্ত্বিক গবেষণাকর্ম নিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটি পাওয়া যাবে ইতালীয় ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থ যার লেখক জিওর্জিও ডিরোস্‌সী (১৯৬৫)। এছাড়া সোস্যুরের বিষয়ে যে অজস্র লেখা প্রকাশিত হয়েছে এই শতকে তার একটা ভালো হিসেবে পাওয়া যায় *Bibliographica saussuriana* (1972) বলে একটি গ্রন্থে যার রচয়িতা বা সংকলক হলেন কোয়ের্নর যিনি একই সময়ে '৭৩-এ সোস্যুরের বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও লেখেন। ফুকো (১৯৬৬) দেরিদার (১৯৬৭) গ্রন্থে আমরা সোস্যুরের তত্ত্বের দার্শনিক দিকটির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাই। একইভাবে জ্যাঁ স্তারোবিনস্কির ১৯৭১এর গ্রন্থে ও ১৯৭৪-৭৫এর নিবন্ধ 'The Two Saussures' ও বাংলায় প্রবালের (১৯৮১) 'দুই সোস্যুরের ভাষাচিন্তা' নিবন্ধগুলিতেও ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব নিয়ে সুন্দর আলোচনা পাওয়া যায়। চিহ্নবিজ্ঞান বিষয়ে যদি একটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করতে হয় তো রোলাঁ বার্থ-এর (১৯৬৪) ফরাসী গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ (১৯৬৭) ও পিএর গুইরোর (১৯৭১—ইংরেজি অনুবাদ ১৯৭৫) বইয়ের নাম করতে হয়। এছাড়া জোনাথান কালারের বইদুটি (১৯৭৫; ১৯৭৬) তো আছেই।

৩. কৃতিত্ব

ভাষাবিজ্ঞানী রূপে সোস্যুরের কৃতিত্বের কথা বলতে গেলেই সেইসব দ্বিত্বের (dicholomy) কথা তুলতে হয় যার ফলে ভাষা-চিন্তা ও ভাষা-চর্চার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এলো। দ্বিত্বের সঠিক প্রয়োজন কী বা এভাবে চিন্তন-বর্ণনের উপযোগিতা কতখানি সেটা বোঝানোর জন্য কালার (১৯৭৬; ২৪-২৫) একটি সুন্দর উদাহরণ দেন। সংক্ষেপে এই উদাহরণটিকে বোঝাতে গেলে এভাবে বলা যায় : ধরা যাক অন্য একটি সংস্কৃতির মানুষ যাদের রঙ-চেনা ও রঙের নামকরণের সঙ্গে আমাদের রয়েছে ভীষণ অমিল, তারা এসেছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পাঠ নিতে এবং এই মুহূর্তে তাদের আমরা বাংলা শেখানোর অঙ্গ হিসেবে রঙ চেনাচ্ছি। অবশ্যই কেউ সাদা-কালো বা লাল-হলুদ-সবুজের ফারাক চিনবেন না তা আশা করছি না—কিন্তু এমন অনেক রঙ আছে—যেমন বেগুনী, খয়েরি, বাদামী বা ফিরোজা—এর যে কোনো একটি দেখাতে গিয়ে আমরা যদি শ' পাঁচেক জিনিষ যোগাড় করে কয়েক ঘণ্টা ধরে প্রতিটিকে দেখাই ছাত্রছাত্রীদের এবং তারপর অন্য একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে নানান রঙের জিনিষের মধ্যে থেকে শুধুমাত্র খয়েরি জিনিষগুলিকেই বেছে নিতে বলি তো দেখা যাবে তারা এখনো অনিশ্চিত যে কোন জিনিষগুলিকে বাছতে হবে। অবশ্যই সেটা হবে খুবই হতাশাজনক। অথচ ভাষা-সংস্কৃতির যেকোনো অভিজ্ঞ শিক্ষকই বুঝতে পারবেন কোথায় ভুল হয়ে গেছে। 'খয়েরি' শেখাতে গিয়ে আমরা যদি খয়েরি আর লাল, খয়েরি ও বাদামী, খয়েরি ও কমলা, খয়েরি ও হলুদ, খয়েরি ও গেরুয়া—এভাবে এগোতাম তুলনা ও বৈপরীত্যের পদ্ধতি ধরে, তাহলে কিন্তু ঐ হতাশার মুখোমুখি হতে হতো না। এথেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে যেকোনো বস্তু বা তথ্য বা প্রকল্পকে বুঝতে গেলে তাকে আরেকটি বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে বুঝে নিতে হবে— মানুষের পৃথিবীতে কোনো বস্তু বা বস্তুনামই একেবারে পৃথক হয়ে একেবারে অসম্বন্ধভাবে অবস্থিত নয়; খয়েরি ও লালের যে বৈপরীত্যের সম্পর্ক তারই সঙ্গে কিন্তু আরো অনেকগুলি সম্পর্ক আছে জড়িয়ে শৃঙ্খলের মতো—যেমন, লাল ও হলুদের সম্বন্ধ, লাল ও নীলের যুগ্ম, কিংবা লাল-কালো, লাল-সাদা, লাল-বাদামী প্রভৃতি। এভাবে বর্ণিল দুনিয়ার রয়েছে একটা অন্তঃ-সম্পর্কের শৃঙ্খলা—একটা ছন্দ। এভাবেই কিন্তু বর্ণের সঙ্গে ধ্বনির পৃথিবী রয়েছে একটা বিশেষ বৈপরীত্য। আছে বর্ণ ও ধ্বনির সঙ্গে রূপের সম্পর্ক। রূপের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ। এই সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা 'সংরচনা' বা structure। এই সম্পর্ক-জাল (network) ও তার চরিত্র থেকেই বোঝা সম্ভব কোনো ভাষা ও সেই ভাষাভাষী সমাজ ও সংস্কৃতির অর্থের জগত কেমন তরো। আর এই কারণেই যেকোনো অবধারণাকে বুঝে নেয়ার পক্ষে যেহেতু এই দ্বিবিধতা বা দ্বিত্ব (binarity) একান্তই আবশ্যক, তাই সোস্যুর

চেষ্টা করেছেন এমন সব দ্বিত্ব-সম্বন্ধের কথা বলার যা ভাষাকে বোঝার প্রয়াসে যুগান্তর এনে দেবে।

এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হলো 'চিহ্নের অযথসম্বন্ধ' (arbitrainess of the sign)। যেকোনো চিহ্নের আছে অর্থ এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় চিহ্নবিশেষের সঙ্গে অর্থবিশেষের রয়েছে অন্যোন্য সম্বন্ধ। কোনো কোনো চিহ্নের দ্ব্যর্থ বা বহ্বর্থ থাকলেও অধিকাংশ চিহ্নেরই থাকে চিহ্নিত বা উদ্দিষ্ট অর্থের সঙ্গে একটা সরাসরি সম্বন্ধ যার থেকে আমাদের ধারণা হতে পারে যে যেকোনো ব্যক্তি, বস্তু বা অমূর্ত কল্পনার সঙ্গে তার নামের রয়েছে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কিন্তু সোস্যুর বললেন এই সম্পর্ক আদৌ এমনটা যথাযথ সম্বন্ধ নয়— বরং এটি একেবারেই অযথসম্বন্ধ। 'কুকুর' বলতে আমরা বা বুঝি তা নিতান্তই একটা সামাজিক সিদ্ধান্ত যা একেবারেই আকস্মিক। যদি কালই বাংলাভাষী সমাজ এই নির্ণয় গ্রহণ করে যে এই চতুষ্পদ জীববিশেষকে 'কুকুর' না বলে তাকে 'মুগুর' বা 'বিড়াল' 'চুহা', 'চতুর' বলে ডাকবে তো সেই সিদ্ধান্তই হবে বহাল। এভাবেই দেখা গেছে, সর্বদেশে সর্বকালে ব্যক্তি বা বস্তুর নামে আসে পরিবর্তন। দেশভেদে একই ভাষাভাষী একই বস্তুকে ভিন্ন নামে ডাকেন—ইংরেজিতে lift এবং elevatorএর উদাহরণটি স্মরণ করা যায় এ প্রসঙ্গে। অর্থসংকোচ ও অর্থপ্রসারকেও এভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। যদিও একথা সত্যি যে 'জাহান' বলতেই একটা বিশেষ ছবি ভেসে ওঠে আমাদের মনে, তবে এও ঠিক যে এই ছবি একেক জনের মনে একেক আকারের, ভিন্ন ভিন্ন রঙের। অতএব চিহ্ন ও চিহ্নিতের মধ্যে সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য নয়। দ্বিতীয়ত, কেউ কেউ এই যুক্তিও দেন যে কিছু কিছু শব্দের বা নামের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়—কারণ শব্দের আকৃতি ও ধ্বনির সঙ্গে তার অর্থের রয়েছে মিল। যেমন, ধ্বন্যাত্মক শব্দ—কুকুরের ভৌ ভৌ' ডাক, বর্ষার 'রিমঝিম' প্রভৃতি। কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে এ যুক্তিও অচল, কারণ যদি এইসব শব্দের সত্যিই তাদের অর্থের অযথসম্বন্ধ না হতো তো সব ভাষাতেই কুকুর একইভাবে ডাকতো—ইংরেজিতে 'bow-wow', ফরাসীতে 'arf-arf' ও বাংলায় ভৌ ভৌ নয়। অথবা সবদেশেই 'শন-শন' হাওয়া, 'রিমঝিম' বর্ষা এমন সব শব্দেরই থাকতো চল। তৃতীয়ত, ভাষামাত্র নামকরণের মাধ্যম নয় বা ভাষাবিশেষে মাত্র একগুচ্ছ নামই নেই, তা যদি হতো তো একভাষা থেকে অন্যভাষায় অনুবাদ জলভাত হতো।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যেকোনো প্রতীক ও তার অর্থের মধ্যেকার সম্বন্ধ হতে পারে অযথ কিংবা যথাযথ—তবে মানব ভাষার ক্ষেত্রে এটি অযথসম্বন্ধই বটে। এক্ষেত্রে এইটেই হলো একটা দ্বিত্ব। দ্বিতীয়ত, এই যে আমরা প্রতীক ও অর্থ কিংবা চিহ্ন (signifier) ও চিহ্নিতের (signified) কথা বলেছি, এদুটিকেও আরেকটি দ্বিত্বরূপে নির্ধারিত করা যায়। এর মধ্যে যখন প্রকৃতপক্ষে মানবভাষা কথিত বা

উচ্চারিত হয় তখন চিহ্নগুলি এমনভাবে পরস্পরের গায়ে-গা সেঁটে মুখ দিয়ে বা মাথা দিয়ে বা কলমের ডগা দিয়ে বেরিয়ে আসে যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সেগুলির মধ্যে বিশ্লেষণী ক্রিয়াকর্ম চালানো কঠিন বা একেবারেই অসম্ভব। বিশেষ করে যখন আমরা অজানা কোনো ভাষায় বলা কথা শুনি তখন মনে হয় এই কথা যেন কথা নয় একটা অজানা ধ্বনিপ্রবাহ মাত্র—নানা রকমের চীৎকারের অসমঞ্জস্য গুচ্ছবিশেষ। অনেকে তো এমনও বলেন যে মনে হচ্ছে মেটে হাঁড়িতে কিছু নুড়ি ঢেলে ঝাঁকানো হচ্ছে। এসবই এজন্য মনে হয় যে আমরা যেহেতু সেই ভাষাবিশেষের বক্তা নই, অথবা আমরা যেহেতু ভাষাবিজ্ঞানী নই—তাই কোথায় বাক্য শুরু কোথায় শেষ বা বাক্যটির মধ্যে কোথায় শব্দের শুরু কোথায় শেষ—কোনো শব্দবিশেষ ক'টি ধ্বনি কিভাবে সাজানো রয়েছে, ধ্বনিগুলির এক একটির সীমা কিভাবে নির্ধারণ করা যায়—তার কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। অথচ ভাষাভাষীমাত্রেই এসবই পারেন— নিজের ভাষাকে বিশিষ্টভাবে (discretely) বুঝতে পারেন—যা কাউকে ইস্কুলে শিখতে হয় না, জন্মসূত্রেই সেই সমাজ-সংস্কৃতিতে সেই ভাষাভাষী রূপে বেড়ে উঠেছে বলে জানেন। বিশ্লিষ্টতা ও অবিশ্লেষের এই খেলাটাও খুবই মজার একটা দ্বিত্ব যার ফলে চিহ্ন ও চিহ্নিতের মধ্যে চিহ্নের বিশ্লেষণটিকে মনে হয় আরো বড়ো চ্যালেঞ্জ। ঠিক যেমন অযথ ও যথাযথের মধ্যে অযথসম্বন্ধের নিয়ম-নির্ধারণ বা সূত্র আবিষ্কার যেমন বেশি মজার চ্যালেঞ্জ।

যেহেতু বিশ্লেষণেই ব্যাখ্যার শেষ নয়, যেহেতু যেকোনো সাধারণ নিয়ম বুঝে নেয়ার জন্য বিশ্লিষ্ট এককগুলির শ্রেণীকরণ করাও দরকার, তাই ভাষা বর্ণনার এই স্তরেও একটা দ্বিত্বের কথা জেনে বুঝে নেয়া উচিত। সেটি হলো এককসমূহের রূপগত (paradigmatic) বনাম 'ন্যাসগত' (syntagmatic) সম্বন্ধ। রূপগত সম্বন্ধ হলো দুটি এককের মধ্যেকার সেই সম্পর্ক যার ফলে এটা বোঝা যায় যে এই দুটি পরস্পর একে অন্যের বদলে ব্যবহারযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, 'রাম', 'আমরা সবাই', 'ছেলেরা', 'যারা কাল এসেছিল সেই লোকগুলো'—এই সবকটিরই ব্যবহার যোগ্যতা রয়েছে এই বাক্যের গোড়ায়: '—খুবই ভালো'। রাম খুবই ভালো, আমরা সবাই খুবই ভালো, ইত্যাদি তার প্রমাণ। তার মানে এই যে এইসব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের সম্বন্ধহীন মনে হলেও এগুলি সবই বিশেষ্যপদ—সব কটিই উদ্দেশ্য স্থানে ব্যবহাযোগ্য বলে। এটি হলো এইসব শব্দ বা পদের মধ্যেকার রূপগত সম্বন্ধ। আবার যদি অন্য একটি বাক্য নিই, যেমন—ইস্কুলে যাচ্ছে', তাহলে দেখা যাবে 'রাম' ও 'ছেলেরা' প্রভৃতি এখানে ব্যবহার করা গেলেও 'আমরা সবাই' কথাটা ব্যবহার করা যাবে না কারণ তা করতে হলে 'যাচ্ছে'-কে বদলে 'যাচ্ছি' করতে হবে তাই বাক্যের বিন্যাসকালে। এই যে আনুভূমিক সম্পর্ক

একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের— যার জন্য রামের সঙ্গে যাচ্ছে ও আমরা-র সঙ্গে যাচ্ছি রয়েছে অচ্ছেদ্য প্রয়োগ-বিধান—এটি কিন্তু রূপগত নয়, ন্যাসগত সম্বন্ধ। প্রাচীন কাল থেকে যা কিছু ব্যাকরণ লেখা হয়ে আসছে তার মধ্যে শুধুমাত্র পদের রূপগত সম্বন্ধ নিয়েই রয়েছে তত্ত্ব ও তথ্য। অথচ ভবিষ্যতের ভাষা বিজ্ঞানে যে পদবিন্যাসই 'শ্রেষ্ঠ আসন লবে' তা বুঝতে পাবার মতো দূরদৃষ্টি ওঁর ছিল।

যে শেষ দ্বিত্বের কথা উল্লেখ করে আমি ইতি টানবো তা হলো অধুনা-অধ্যয়ন (synchrony) বনাম কালগত অধ্যয়ন (diachrony) বিষয়ক। সোস্যুরের সময়েও, বহুদিন ধরেই, ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে জোরটা ছিল ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই। তখনি সংস্কৃত ভাষাকে 'আবিষ্কার' করলেন ইউরোপীয় ভাষাবিদেরা, গড়ে উঠলো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব ও নানান নতুন সূত্রাবলী ও তত্ত্ব আবিষ্কার হতে থাকলো। তবে এভাবে যে ভাষাবিজ্ঞান বেশিদূর এগোতে পারবে না তা সোস্যুর বহু আগেই বুঝেছিলেন। এই philological approuch যে একটা সীমার পর এগোতে পারে না সে বিষয়ে ৪ঠা জানুয়ারি ১৮৯৪ সালে আঁতোয়ান মেইয়ে-কে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন :

> "... I am fed up with all that, and with the general difficulty of writing even ten lines of good sense on linguistic matters. For a long time I have been above all preacupied with the logical classification of linguistic fads and with the classification of the points of view from which we heat them: and I am more and more aware of the immense amount of work that would be required to show the linguist what he is doing. The other inadquacy of cument term the need to reform it and, in order to that, to demoustrate what sort of object language is, continually spoils my pleasure in philology..." (cahiers Ferdinand de 21m 1964:95)।

সোস্যুর বললেন যে ভাষাবিজ্ঞানীর মূল সমস্যা হলো এই যে ভাষা সর্বদেশে সর্বকালে পরিবর্তনশীল—একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষের মুখের কথা যাচ্ছে বদলে (যদি দুজনে এক ভাষাভাষী হয় তাও), বদলাচ্ছে এক সময় থেকে অন্য সময়ে—প্রতি মুহূর্তেই, বদলাচ্ছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। তবে যদি আমরা এই পরিবর্তনশীলতার ভয়ে ব্যাকরণচর্চাই বন্ধ করে দিই তো ভাষাতত্ত্বের প্রগতি হবে অবরুদ্ধ। আর এইজন্য একথাও বলা যাবে না যে ভাষার মাত্র ঐতিহাসিক অধ্যয়নই সম্ভব। উনি বললেন বরং আমরা ভাষার এমন এক অধুনা অধ্যয়নের কথা ভাববো যাতে একথা ধরে নেবো যে ভাষার বর্ণনা আমি যে সময়ে করছি— যে-

সময়ের ভাষা নিয়ে আমার সূত্রাবলী গড়ে তুলছি ব্যাকরণের— সেই সময়ে ভাষা আছে অপরিবর্তিত। এই কালিক বা ক্ষণিক অপরিবর্তনের 'ভান'-ই (assumptim) অধুনা-অধ্যয়নের প্রাণ। এতে যেটুকু অনৃত রয়েছে তা বৈজ্ঞানিক প্রগতির পক্ষে দরকার কারণ পদার্থবিদ্যা থেকে সমস্ত তাত্ত্বিক বিজ্ঞানেই এমন ভান একান্তই আবশ্যিক। বলছেন সমস্ত কালগত অধ্যয়নই কিন্তু অধুনা-অধ্যয়ন প্রণালীরই প্রয়োগ-জাত। কারণ আমরা যখন দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতকের বাংলা ভাষার বিকাশের কথা বলবো তখন এইসব শতকের প্রতিনিধি ভাষারূপ হিসেবে মাত্র গুটিকয়েক 'পাঠ'-কেই (text) গ্রহণ করে বিকাশের ধারা-নিরূপণ করার চেষ্টা করবো। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বলতে হবে যে দ্বাদশ শতকের প্রতিনিধি হিসেবে যে বিশেষ পাঠটিকে আমি নিয়েছি ঐ শতকের এই ভাষাভাষী সব মানুষই নিশ্চয়ই একইভাবে বাংলা লিখতেন বা বলতেন না। পাঠটি তাই মাত্র এক ধরনের ভাষারূপেরই প্রয়োগ বিশেষ। ফলে সত্যি কথা বলতে গেলে দশ-বিশটা প্রাচীন পাঠের অধুনা-অধ্যয়ন করে তার পরিণামকে কালের মাত্রায় স্থাপন করেই আমরা কোনো ভাষার ইতিহাস রচনা করতে পারি। তাই এখানেও, ওর মতে, কালগত অধ্যয়নের থেকেও জরুরী হলো অধুনা-অধ্যয়ন।

সোস্যুরের বক্তব্য ও চিন্তাধারা থেকে যে সংরচনাবাদের জন্ম হলো তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী—কারণ যে কোনো সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এইসব দ্বিত্বের প্রয়োগ সম্ভব ও জরুরীও। সোস্যুরের অনুযায়ীরা শুধু ভাষাবিজ্ঞানী নন, মনোবিজ্ঞান-সমাজশাস্ত্র-সাহিত্যতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব-নন্দনতত্ত্ব—সর্বত্রই এইসব অবধারণার প্রয়োগ দেখা গেলো—আজও দেখা যাচ্ছে।

গ্রন্থপঞ্জী

Cahiers Ferdinand de Saussure 21 (1964), esp. 'Lettres de F. de saussure a Antoine Meillet; pp 95

Course in General Linguisties. tr. by wade Baskin. London: Owen, 1960; Fontana 1974

Culler, Jonathan (1975) Struchuralist Poetics : Structuralism, Linguistics & the study of Literature. London: Routledge.

------ (1976) Saussure. Fontama

Derossi. Giorgis (1965) segno e struttura linguistici nel pensiero di F. de saussure Udine : Del Bianco

Foucault, Michel (1966) les Mots et les choses. Paris : Gallimard. Tr. as 'The order of things' London: Tavistock (1970)

Derrida, Jacques (1972) Marges, de la plilosophie. Paris : Minuit.

Guirand, Pierre (1975) Semiology (Eng tr) London: Routledge

Koerner, E.F.K. (1972) Bibliographia saussuriana. Metrchen : scarecrow press

—— (1973) Ferdinand de saussure: The Origin and Development of his Linguistic Thought in western studies of Language. Braunschweing : Vieweg

Starobinski, Jean (1971) Les Mots sous les mots : les anagrammes de F, de Saussure. Paris : Gallimard

—— (1974-5) 'The Two Saussures' Vol 1, Semiotexte 1.2 (Fall '74). Vol. II in semiotexte II. (1975)

দাশগুপ্ত, প্রবাল (১৯৮১) 'দুই সোস্যুরের ভাষাচিন্তা; জিজ্ঞাসা ২.২ পৃ. ৫৪১-৫১